দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ফাহমিদুল হক, মোহাম্মদ আজম, মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, দেবাশীষ কুমার কুন্ডু, আ-আল মামুন, সামিনা লুৎফা, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, বখতিয়ার আহমদ বাদল, হাফিজুর রহমান কার্জন, মুনতাসির মাসুম, মামুন আল মোস্তফা, রুশাদ ফরিদী, মো. নূরুজ্জামান, শান্তনু মজুমদার

বেতন-স্কেল নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কে বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গটি নানাভাবে আলোচনায় এসেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের নিয়ে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদাধিকারী থেকে শুরু করে পদহীন গৌণ ব্যক্তি পর্যন্ত বহুজন মন্তব্য করেছেন। এ আলোচনার সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, মন্তব্যগুলো সম্ভবত খুব ভেবেচিন্তে করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক এবং শিক্ষকদের সম্মান ও গুরুত্ব নিয়ে ভাবেন এমন বহুজনও লিখিত বা মৌখিক মন্তব্য করেছেন। এঁদের লেখায় বা মন্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকসমাজের সম্মান রক্ষার কথাটা বার বার বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত বেতনস্কেলে অন্যায্যভাবে শিক্ষকসমাজের সম্মানহানির প্রেক্ষাপটে এঁদের তৎপরতা প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আলোচনা বা বিতর্কের ধরনটা দাঁড়িয়েছে অনেকটা পেশাজীবীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো।

এই তর্ক-বিতর্কের সবচেয়ে লাভের দিকটা এই যে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা জনপরিসরের আলোচনার বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে। আলোচনাটা এভাবে হওয়া হয়ত খুব কাজের কথা নয়; কারণ, বিশেষায়িত এ খাতের আলোচনা বিশেষ মেজাজেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু জনপরিসরে আলোচিত হওয়াটা কম গুরুত্বের নয়। বাংলাদেশে সাধারণত উচ্চশিক্ষা-সম্পর্কিত সবচেয়ে স্পর্শকাতর সিদ্ধান্তগুলোও গোপনে নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক কোর্স বা সেমিস্টার পদ্ধতি চালুর ক্ষেত্রে কোনো পর্যালোচনামূলক পর্যায় দেখা যায়নি। গোপনীয় কায়দায় সিদ্ধান্ত নেয়ার সবচেয়ে বড় উদাহরণ 'ইউজিসির বিশ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র'। উচ্চশিক্ষার বৈপ্লবিক বদলের প্রস্তাব-সম্বলিত ওই দলিলটি তৈরি করেছে বিশ্বব্যাংক—দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষ নয়। এ বাস্তবতা মনে রাখলে পাবলিক পরিসরে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব বোঝা যাবে।

কিন্তু তর্ক-বিতর্কের বর্তমান প্রবাহকে অনুসন্ধানী পর্যালোচনার দিকে নিয়ে যাওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট শুধু শিক্ষকদের বেতনভাতা আর সম্মানের ব্যাপার নয়। বরং রাষ্ট্র এবং সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নটি এত খেলোভাবে নিচ্ছে কেন, সেটিই জরুরি প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা পড়ে আর মাস্টাররা পড়ায়—এটা বাংলাদেশের আলাদা কোনো বাস্তবতা নয়। সারা দুনিয়া থেকে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে আলাদা করে দেখার কোনো উপায় নেই।

আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভ্যন্তরীণ দুর্দশা অতি প্রকট। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্ণীয় কোনো বিভাজন নেই। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর মান যাচাইয়ের পর্যালোচনামূলক পদ্ধতি চালু নেই। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে বিষয়ের পুনর্বিন্যাসের কোনো আয়োজন নেই। আন্তঃডিসিপ্লিন সম্পর্ক এখানে খুবই নাজুক। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং যোগ্যতা অনুসারে বিভাগ পরিবর্তন বা বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রি নেয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। শতবর্ষ-প্রাচীন বিভাগীয় দেয়ালের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবেষণার আবশ্যিক সম্পর্কটি বাংলাদেশে প্রায় অচেনাই থেকে গেছে। গবেষণা বলতে এখানে সাধারণভাবে বোঝা হয় ব্যক্তি-শিক্ষকের ব্যক্তিগত উদ্যোগের উচ্চডিগ্রি এবং শিক্ষকদের ব্যক্তিগত কাজ। গবেষণা-পত্রিকাগুলোর অবস্থাও শোচনীয়। এই পুরো ব্যাপারটির সঙ্গে অর্থায়নের প্রসঙ্গটি যুক্ত। আর অর্থায়নের ব্যাপারটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের সঙ্গে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র সাধারণভাবে তার নীতিনির্ধারণী কায়কারবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হয় না। নিয়ন্ত্রক অন্য রাষ্ট্র, নিয়ন্ত্রক বিশ্বসংস্থা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওর 'গবেষণা'ই আজতক এ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে, রাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্গতি আর রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার প্রেক্ষাপটে, 'নৈর্ব্যক্তিক' গবেষণার প্রয়োজন বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ই কেবল তার স্বভাব ও পদ্ধতিগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে এ ধরনের নিয়ন্ত্রক 'নৈর্ব্যক্তিক' গবেষণার ধারা তৈরি করতে পারে। দুনিয়ার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা নির্ভুলভাবে সেই সাক্ষ্যই দেয়। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়—উভয়েরই

তৎপর হওয়ার সময় এসেছে।

আমরা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়-পরিস্থিতির তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন চাই। বিদ্যমান ধারাবাহিকতার ক্রমিক রদবদলের মধ্যেই সে কাজ শুরু হতে পারে। তবে 'ইউজিসির কৌশলপত্রে'র প্রস্তাব দিয়ে তা হবে না। কারণ, বিশ্ববাজারে কুশলী স্নাতক সরবরাহ করা ছাড়া এ কৌশলপত্রে অন্য কোনো উচ্চাশার ইশারা নাই। কী ভাবে হবে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। আন্তরিক এবং লিপ্ত আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই হয়ত সম্ভাব্য পথগুলো উন্মোচিত হবে। আজকের আয়োজন সে তৎপরতার সূত্রপাত মাত্র।

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণের সংখ্যাবৃদ্ধি, উচ্চশিক্ষার মান এবং শিক্ষকদের মর্যাদা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সে আলোচনায় ধারাবাহিকভাবে শামিল হতে চাই ও আগ্রহী সবাইকে যুক্ত করতে চাই। বেতন-স্কেল নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কে উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গটি নানাভাবে তর্ক-বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা জনপরিসরের আলোচনায় জায়গা করে নিয়েছে। চলমান তর্ক-বিতর্কের প্রবাহকে রাজনৈতিক পর্যালোচনার দিকে নিয়ে যাওয়া দরকার। এজন্য সামাজিক শক্তিসমূহের মতামত জানার মধ্য দিয়ে তার উন্মোধন হতে পারে।

শুরুতেই আমরা পরিষ্কার করে নিতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দর্শনটা কী, কেন এটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়? এটা কী কেবল পাবলিক মানি দ্বারা পরিচালিত হয় বলে নাকি গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান তৈরিতে ভূমিকা রাখে বলে। রাজনৈতিক অবদানের বিষয়টি কীভাবে এই ধারণার মধ্যে আসতে পারে?

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ধারণার মধ্যে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, যেমন-কৃষি, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল কীভাবে অন্তর্ভুক্ত? কোন্ কোন্ বিষয় ও উপাদানের উপস্থিতি একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়-ধারণার মধ্যে কি পার্থক্য আছে? যেমন পাশ্চাত্যে শিক্ষণ ও গবেষণার জন্য আলাদা আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

১৯৭৩ সালের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের আওতাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্থক্য কী? বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার ক্ষেত্রে সরকার ও ইন্ডাস্ট্রির নিরন্তর সহযোগিতার ধরন এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সহযোগিতার ক্ষেত্র কেমন হবে?

এসব বিষয়কে মাথায় রেখে আমরা এই আলোচনাকে মূলত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত দু'ভাগে বিন্যস্ত করতে পারি।

১. বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক পর্যালোচনা ২. বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম

এর আওতায় বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক বিতর্ক আমরা উস্কে দিতে চাই: ❑ ইউজিসির বিশ বছর মেয়াদী কৌশলপত্রে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের নামে বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়া আয় বাড়ানোর প্রস্তাবের ফলাফল হিসেবে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাষ্ট্রের সম্পর্কের পর্যালোচনা ❑ উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য: মেধালালন ও জ্ঞান সৃষ্টি বনাম বাজারের চাহিদা মোতাবেক জনশক্তি উৎপাদন ❑ উচ্চশিক্ষায় রাষ্ট্রের বরাদ্দ বনাম কেবল বেতন বরাদ্দ ❑ মানসম্মত গবেষণার কী হবে? শিক্ষকদের যোগ্যতা ও প্রস্তুতি ❑ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বনাম অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা ❑ শিক্ষক/ছাত্র রাজনীতি বনাম দলীয় হস্তক্ষেপ ❑ শিক্ষকদের দায়দায়িত্ব বনাম ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশের অধীনে বিবেকের স্বাধীনতা ❑ চার বছর মেয়াদী সম্মান, শিক্ষা কার্যক্রম, শিখন-শিক্ষণ-মূল্যায়ন, নতুন বিভাগ স্থাপন, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ❑ শিক্ষকের আনুষ্ঠানিক মর্যাদা, বেতন-ভাতা-উচ্চশিক্ষা সুযোগ: কন্সালটেন্সি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো ❑ অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও গণতন্ত্র: লেখাপড়া, সহশিক্ষা কার্যক্রম, ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচন ❑ পরিকল্পিত স্থাপনা ও অবকাঠামো: আবাসন, লাইব্রেরি, শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট, খাবার দোকান

সংস্কার সম্ভব! কিন্তু তার রূপরেখা কী হবে?

[গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক আয়োজিত গোলটেবিলে এই ধারণাপত্রটি উত্থাপিত হয়।]

● লেখকবৃন্দ: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক